র বী ন্দ্র না থ ঠা কু র
সঙ্গীত ও কবিতা

বলা বাহুল্য, আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি তখন তাহাকে শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টিরূপে দেখি না -- কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। আমরা সঙ্গীতকেও সেইরূপ দেখিতে চাই। সঙ্গীত সুরের রাগ রাগিণী নহে, সঙ্গীত ভাবের রাগ রাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা সঙ্গীতও তেমনি ভাবের ভাষা। তবে, কবিতা ও সঙ্গীতে প্রভেদ কি ? আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

আমরা সচরাচর যে ভাষায় কথা কহিয়া থাকি তাহা যুক্তির ভাষা। "হাঁ" কি "না", ইহা লইয়াই তাহার কারবার। "আজ এখানে গেলাম", "কাল সেখানে গেলাম", "আজ সে আসিয়াছিল", "কাল সে আসে নাই", "ইহা রূপা", "উহা সোনা" ইত্যাদি। এ-সকল কথার উপর যুক্তি চলে। "আজ আমি অমুক জায়গায় গিয়াছিলাম" ইহা আমি নানা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি। দ্রব্যবিশেষ রূপা কি সোনা ইহাও নানা যুক্তির সাহায্যে আমি অন্যকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি। অতএব, সচরাচর আমরা যে-সকল বিষয়ে কথোপকথন করি, তাহা বিশ্বাস করা না-করা যুক্তির ন্যূনাধিক্যের উপর নির্ভর করে। এই-সকল কথোপকথনের জন্য আমাদের প্রচলিত ভাষা, অর্থাৎ গদ্য নিযুক্ত রহিয়াছে।

কিন্তু বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া এক, আর উদ্রেক করাইয়া দেওয়া স্বতন্ত্র। বিশ্বাসের শিকড় মাথায়, আর উদ্রেকের শিকড় হৃদয়ে। এই জন্য, বিশ্বাস করাইবার জন্য যে ভাষা উদ্রেক করাইবার জন্য সে ভাষা নহে। যুক্তির ভাষা গদ্য আমাদের বিশ্বাস করায় আর কবিতার ভাষা পদ্য আমাদের উদ্রেক করায়। যেসকল কথায় যুক্তি খাটে তাহা অন্যকে বুঝান অতিশয় সহজ ; কিন্তু যাহাতে যুক্তি খাটে না, যাহা যুক্তির আইন-কানুনের মধ্যে ধরা দেয় না, তাহাকে বুঝান সহজ ব্যাপার নহে। "কেন"-নামক একটা চশমা-চক্ষু দুর্দ্দান্ত রাজাধিরাজ যেমনি কৈফিয়ৎ তলব করেন, অমনি সে আসিয়া হিসাবনিকাশ করিবার জন্য হাজির হয় না। যে-সকল সত্য মহারাজ "কেন"র প্রজা নহে, তাহাদের বাসস্থান কবিতায়। আমাদের হৃদয়-গত সত্য-সকল "কেন"কে বড় একটা কেয়ার করে না। যুক্তির একটা ব্যাকরণ আছে, অভিধান আছে, কিন্তু আমাদের রুচির অর্থাৎ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের আজ পর্য্যন্ত একটা ব্যাকরণ তৈয়ারি হইল না। তাহার প্রধান কারণ, সে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে নির্ভয়ে বাস করিয়া থাকে -- এবং সে দেশে "কেন"-আদালতের ওয়াসরন্ট্ জারি হইতে পারে না। একবার যদি তাহাকে যুক্তির সামনে খাড়া করিতে পারা যাইত, তাহা হইলেই তাহার ব্যাকরণ বাহির হইত। অতএব, যুক্তি যে-সকল সত্য বুঝাইতে পারে না বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, কবিতা সেই-সকল সত্য বুঝাইবার ভার নিজস্কন্ধে লইয়াছে। এই নিবিত্ত স্বভাবতই যুক্তির ভাষা ও কবিতার ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় এমন হয় যে, শত সহস্র প্রমাণের সাহায্যে একটা সত্য আমরা বিশ্বাস করি মাত্র, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে সে সত্যের উদ্রেক হয় না। আবার অনেক সময়ে একটি সত্যের উদ্রেক হইয়াছে, শত সহস্র প্রমাণে তাহা ভাঙ্গিতে পারে না। এক জন নৈয়ায়িক যাহা পারেন না, এক জন বাগ্মী তাহা পারেন। নৈয়ায়িক ও বাগ্মীতে প্রভেদ এই, নৈয়ায়িকের হস্তে যুক্তির কুঠার ও বাগ্মীর হস্তে কবিতার চাবি। নৈয়ায়িক কোপের উপর কোপ্ বসাইতেছেন, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার ভাঙ্গিল না ; আর, বাগ্মী কোথায় একটু চাবি ঘুরাইয়া দিলেন, দ্বার খুলিয়া গেল। উভয়ের অস্ত্র বিভিন্ন।

আমি যাহা বিশ্বাস করিতেছি তোমাকে তাহাই বিশ্বাস করান, আর আমি যাহা অনুভব করিতেছি তোমাকে তাহাই অনুভব করান -- এ দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। আমি বিশ্বাস করিতেছি একটি গোলাপ সুগোল, আমি তাহার চারি দিক মাপিয়া-জুকিয়া তোমাকে বিশ্বাস করাইতে পারি যে গোলাপ সুগোল -- আর, আমি অনুভব করাইতে পারি না যে গোলাপ সুন্দর। তখন কবিতার সাহায্য অবলম্বন করিতে হয়। গোলাপের সৌন্দর্য্য আমি যে উপভোগ করিতেছি তাহা এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তোমার মনেও সে সৌন্দর্য্যভাবের উদ্রেক হয়। এইরূপ প্রকাশ করাকেই বলে কবিতা। চোখে চোখে চাহনির মধ্যে যে যুক্তি আছে, যাহাতে করিয়া প্রেম ধরা পড়ে -- অতিরিক্ত যত্ন করার মধ্যে যে যুক্তি আছে, যাহাতে করিয়া প্রেমের অভাব ধরা পড়ে- কথা না কহার মধ্যে যে যুক্তি আছে, যাহাতে

অসীম কথা প্রকাশ করে -- কবিতা সেই-সকল যুক্তি ব্যক্ত করে।
সচরাচর কথোপকথনে যুক্তির যতটুকু আবশ্যক তাহারই চূড়ান্ত আবশ্যক দর্শনে বিজ্ঞানে। এই নিমিত্ত দর্শন বিজ্ঞানের গদ্য কথোপকথনের গদ্য হইতে অনেক তফাৎ। কথোপকথনের গদ্যে দর্শন বিজ্ঞান লিখিতে গেলে যুক্তির বাঁধুনি আল্‌গা হইয়া যায়। এই নিমিত্ত খাঁটি নিভাঁজ যুক্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার চুল-চেরা তীক্ষ্ম পরিষ্কার ভাষা নির্ম্মাণ করিতে হয়। কিন্তু তথাপি সে ভাষা গদ্য বৈ আর কিছু নয়। কারণ, যুক্তির ভাষাই নিরলঙ্কার সরল পরিষ্কার গদ্য।
আর, আমরা সচরাচর কথোপকথনে যতটা অনুভাব প্রকাশ করি তাহারই চূড়ান্ত প্রকাশ করিতে হইলে কথোপকথনের ভাষা হইতে একটা স্বতন্ত্র ভাষাার আবশ্যক করে। তাহাই কবিতার ভাষা -- পদ্য। অনুভাবের ভাষাই অলঙ্কারময়, তুলনাময় পদ্য। সে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য আঁকুবাঁকু করিতে থাকে -- তাহার যুক্তি নাই, তর্ক নাই, কিছুই নাই। আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার তেমন সোজা রাস্তা নাই। সে নিজের উপযোগী নূতন রাস্তা তৈরি করিয়া লয়। যুক্তির অভাব মোচন করিবার জন্য সৌন্দর্য্যের শরণাপন্ন হয়। সে এমনি সুন্দর করিয়া সাজে যে, যুক্তির অনুমতিপত্র না থাকিলেও সকলে তাহাকে বিশ্বাস করে। এমনি তাহার মুখখানি সুন্দর, যে, কেহই তাহাকে "কে" "কি বৃত্তান্ত" "কেন" জিজ্ঞাসা করে না, কেহ তাহাকে সন্দেহ করে না, সকলে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া ফেলে, সে সৌন্দর্য্যের বলে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু নিরলঙ্কার যৌক্তিক সত্যকে প্রতি পদে বহুবিধ প্রমাণ-সহকারে আত্মপরিচয় দিয়া আত্মস্থাপনা করিতে হয়, দ্বারীর সন্দেহভঞ্জন করিতে হয়, তবে সে প্রবেশের অনুমতি পায়। অনুভাবের ভাষা ছন্দোবদ্ধ। পূর্ণিমার সমুদ্রের মত তালে তালে তাহার হৃদয়ের উত্থান পতন হইতে থাকে, তালে তালে তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে থাকে। নিশ্বাসের ছন্দে, হৃদয়ের উত্থানপতনের ছন্দে তাহার তাল নিয়মিত হইতে থাকে। কথা বলিতে বলিতে তাহার বাধিয়া যায়, কথার মাঝে মাঝে অশ্রু পড়ে, নিশ্বাস পড়ে, লজ্জা আসে, ভয় হয়, থামিয়া যায়। সরল যুক্তির এমন তাল নাই, আবেগের দীর্ঘনিশ্বাস পদে পদে তাহাকে বাধা দেয় না। তাহার ভয় নাই, লজ্জা নাই, কিছুই নাই। এই নিমিত্ত, চূড়ান্ত যুক্তির ভাষা গদ্য, চূড়ান্ত অনুভাবের ভাষা পদ্য।
আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে -- কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন-কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্ম্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সঙ্গীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই। যেমন, কথোপকথনে আমরা যে-সকল কথা যেরূপ শৃঙ্খলায় ব্যবহার করি, কবিতায় আমরা সে-সকল কথা সেরূপ শৃঙ্খলায় ব্যবহার করি না -- কবিতায় আমরা বাছিয়া বাছিয়া কথা লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি--তেমনি কথোপকথনে আমরা যে-সকল সুর যেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি সঙ্গীতে সেসকল সুর সেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি না, সুর বাছিয়া লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি। কবিতায় যেমন বাছা বাছা সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সঙ্গীতেও তেমনি বাছা বাছা সুন্দর সুরে ভাব প্রকাশ করে। যুক্তির ভাষায় প্রচলিত কথোপকথনের সুর ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক করে না। কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সঙ্গীতের সুর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সঙ্গীত অবিকল কবিতার ন্যায়। সঙ্গীতেও ছন্দ আছে। তালে তালে তাহার সুরের লীলা নিয়মিত হইতেছে। কথোপকথনের ভাষায় সুশৃঙ্খল ছন্দ নাই, কবিতায় ছন্দ আছে, তেমনি কথোপকথনের সুরে সুশৃঙ্খল তাল নাই, সঙ্গীতে তাল আছে। সঙ্গীত ও কবিতা উভয়ে ভাব-প্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। তবে, কবিতা ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সঙ্গীত ততখানি করে নাই। তাহার একটি প্রধান কারণ আছে। শূন্যগর্ভ কথার কোন আকর্ষণ নাই -- না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কানে তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে, তাহা কানে মিষ্ট শুনায়। এই জন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সঙ্গীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এক কালে যে দাস ছিল আর-এক কালে সেই প্রভু হইয়াছে। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখনিচ সুখানিচ -- কিন্তু এ চক্র কি আর ফিরিবে না ? যেমন ভারতবর্ষের ভূমি উর্ব্বরা হওয়াতেই ভারতবর্ষের

অনেক দুর্দ্দশা, তেমনি সঙ্গীতের ভূমি উর্ব্বরা হওয়াতেই সঙ্গীতের এমন দুর্দ্দশা। মিষ্ট সুর শুনিবামাত্রই ভাল লাগে, সেই নিমিত্ত সঙ্গীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাব কর্ষণ করিতে হয় নাই-কিন্তু শুদ্ধ মাত্র কথার যথেষ্ট মিষ্টতা নাই বলিয়া কবিতাকে প্রাণের দায়ে ভাবের চর্চ্চা করিতে হইয়াছে, সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সঙ্গীতের এমন অবনতি।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, কবিতা ও সঙ্গীতে আর কোন তফাৎ নাই, কেবল ইহা ভাবপ্রকাশের একটা উপায়, উহা ভাবপ্রকাশের আর-একটা উপায় মাত্র। কেবল অবস্থার তারতম্যে কবিতা উচ্চশ্রেণীতে উঠিয়াছে ও সঙ্গীত নিম্নশ্রেণীতে পড়িয়া রহিয়াছে ; কবিতায় বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও প্রস্তরের ন্যায় স্থূল সমুদয় ভাবই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু সঙ্গীতে এখনো তাহা করা যায় না। কবি Matthew Arnold তাঁহার "Epilogue to Lessing's Laocoon" - নামক কবিতায় চিত্র সঙ্গীত ও কবিতার যে প্রভেদ স্থির করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম নিজ ভাষায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তিনি বলেন -- চিত্রে প্রকৃতির এক মুহূর্ত্তের বাহ্য অবস্থা প্রকাশ করা যায় মাত্র। যে মুহূর্ত্তে একটি সুন্দর মুখে হাসি দেখা দিয়াছে সেই মুহূর্ত্তটি মাত্র চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরমুহূর্ত্তটি আর তাহাতে নাই। যে মুহূর্ত্তটি তাঁহার শিল্পের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শুভ মুহূর্ত্ত সেই মুহূর্ত্তটি অবিলম্বে বাছিয়া লওয়া প্রকৃত চিত্রকরের কাজ। তেমনি মনের একটি মাত্র স্থায়ী ভাব বাছিয়া লওয়া, ভাবশৃঙ্খলের একটি মাত্র অংশের উপর অবস্থান করিয়া থাকা সঙ্গীতের কাজ। মনে কর, আমি বলিলাম, "হায়"। কথাটা ঐখানেই ফুরাইল, কথায় উহার অপেক্ষা আর অধিক প্রকাশ করিতে পারে না। আমার হৃদয়ের একটি অবস্থাবিশেষ ঐ একটি মাত্র ক্ষুদ্র কথায় প্রকাশ হইয়া অবসান হইল। সঙ্গীত সেই "হায়" শব্দটি লইয়া তাহাকে বিস্তার করিতে থাকে, "হায়" শব্দের হৃদয় উদঘাটন করিতে থাকে, "হায়" শব্দের হৃদয়ের মধ্যে যে গভীর দুঃখ, যে অতৃপ্ত বাসনা, যে আশার জলাঞ্জলি প্রচ্ছন্ন আছে, সঙ্গীত তাহাই টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে থাকে, "হায়" শব্দের প্রাণের মধ্যে যতটা কথা ছিল সবটা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লয়। কিন্তু কবিতার কাজ আরো বিস্তৃত। চিত্র-করের ন্যায় মুহূর্ত্তের বাহ্যশ্রীও তাঁহার বর্ণনীয়, গায়কের ন্যায় ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসও তাঁহার গেয়। তাহা ছাড়া -- জীবনের গতিস্রোত তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়! ভাব হইতে ভাবান্তরে তাঁহাকে গমন করিতে হয়। ভাবের গঙ্গোত্রী হইতে ভাবের সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হয়। কেবলমাত্র স্থির আকৃতি তিনি চিত্র করেন না, এক সময়ের স্থায়ী ভাব মাত্র তিনি বর্ণনা করেন না, গম্যমান শরীর, প্রবাহমান ভাব, পরিবর্ত্তমান অবস্থা তাঁহার কবিতার বিষয়। -- অতএব ম্যাথিউ আর্ণল্‌ডের মতে চলনশীল ভাবের প্রত্যেক ছায়ালোক সঙ্গীতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। সঙ্গীত একটি স্থায়ী স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমরা এই বলি যে, গতিশীল ভাব যে সঙ্গীতের পক্ষে একেবারে অননুসরণীয় তাহা নহে, তবে এখনো সঙ্গীতের সে বয়স হয় নাই। সঙ্গীত ও কবিতায় আমরা আর কিছু প্রভেদ দেখি না, কেবল উন্নতির তারতম্য। উভয়ে যমজ ভ্রাতা, এক মায়ের সন্তান ; কেবল উভয়ের শিক্ষার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে মাত্র।

দেখা গেল সঙ্গীত ও কবিতা এক শ্রেণীর। কিন্তু উভয়ের সহিত আমরা কতখানি ভিন্ন আচরণ করি তাহা মনোযোগ দিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে। এখন সঙ্গীত যেরূপ হইয়াছে কবিতা যদি সেরূপ হইত তাহা হইলে কি হইত ? মনে কর এমন যদি নিয়ম হইত যে, যে কবিতায় চতুর্দ্দশ ছত্রের মধ্যে, বসন্ত, মলয়ানিল, কোকিল, সুধাকর, রজনীগন্ধা, টগর ও দুরন্ত এই কয়েকটি শব্দ বিশেষ শৃঙ্খলা অনুসারে পাঁচ বার করিয়া বসিবে, তাহারই নাম হইবে কবিতা বসন্ত -- ও যদি কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ কবিদিগকে ফরমাস করিতেন, "ওহে চণ্ডিদাস, একটা কবিতা বসন্ত, ছন্দ ত্রিপদী আওড়াও ত!" অমনি যদি চণ্ডিদাস আওড়াইতেন --

বসন্ত মলয়ানিল, রজনীগন্ধা কোকিল,
দুরন্ত টগর সুধাকর --
মলয়ানিল বসন্ত, রজনীগন্ধা দুরন্ত,
সুধাকর কোকিল টগর।

ও চারি দিক হইতে "আহা আহা" পড়িয়া যাইত, কারণ কথাগুলি ঠিক নিয়মানুসারে বসান হইয়াছে -- তাহা হইলে কবিতা কতকটা আধুনিক গানের মত হইত। ঐ কয়েকটি কথা ব্যতীত আর-একটি কথা যদি বিদ্যাপতি বসাইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ "ধিক্ ধিক্" করিতেন

ও তাঁহার কবিতার নাম হইত "কবিতা জংলা বসন্ত।" এরূপ হইলে আমাদের কবিতার কি দ্রুত উন্নতিই হইত ! কবিতার ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বাহির হইত, বিদেশবিদ্বেষী জাতীয়ভাবোন্মত্ত আর্য্য-পুরুষগণ গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, উঃ, আমাদের কবিতায় কতগুলা রাগ রাগিণী আছে, আর অসভ্য ম্লেচ্ছদের কবিতায় রাগ রাগিণীর লেশ মাত্র নাই।

আমরা যেমন আজ কাল নবরসের মধ্যেই মারামারি করিয়া কবিতাকে বন্ধ করিয়া রাখি না, অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত আড়ম্বরপূর্ণ নামের প্রতি দৃষ্টি করি না -- তেমনি সঙ্গীতে কতকগুলা নাম ও নিয়মের মধ্যেই যেন বদ্ধ হইয়া না থাকি। কবিতারও যে স্বাধীনতা আছে সঙ্গীতেরও সেই স্বাধীনতা হউক, কারণ সঙ্গীত কবিতার ভাই। যেমন সন্ধ্যার বিষয়ে কবিতা রচনা করিতে গেলে কবি সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করিতে থাকেন ও তাঁহার প্রতি কথায় সন্ধ্যা মূর্তিমতী হইয়া উঠে, তেমনি সন্ধ্যার বিষয়ে গান রচনা করিতে গেলে রচয়িতা যেন চোখ কান বুজিয়া পুরবী না গাহিয়া যান, যেন সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করেন, তাহা হইলে অবসান দিবসের ন্যায় তাঁহার সুরও আপনা-আপনি নামিয়া আসিবে, মুদিয়া আসিবে, ফুরাইয়া আসিবে। প্রত্যেক গীতিকবিদের রচনায় গানের নূতন রাজ্য আবিষ্কার হইতে থাকিবে। তাহা হইলে গানের বাল্মীকি গানের কালিদাস জন্মগ্রহণ করিবেন।